

Available online at <http://www.ijims.com>

ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343

IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

Development of Rama-Katha in regional literatures

প্রাদেশিক সাহিত্যে রামকথাচর্চা

Sisir Kumar Dhali

Assistant Teacher, Goyeshwari Pyari Bhuban Vidyanketan, Scholar, University of Gour Banga

Abstract:

The traditional glory of Rama-Katha (The tale of Lord Rama) is very old. Mention of Rama is found in Vedic literature, but there no narratives on Rama. The Ramayana, composed by Valmiki, is the first complete literature based on Rama's life & deeds. As he composed this great epic based on different essence of religious, cultures & traditions of common people, he is worship as Adi Kavi. The literary impact on the Ramayana is also available in Buddhist and Jain literature and several poetries have been composed based on the Rama-Katha. Several narrative literatures in regional languages have also been composed based on Valmiki Ramayana. But it is notable that the divine personification of Rama is presented after the period of Valmiki. Through the Ramayana contemporary social issues, religious beliefs, political & philosophical thoughts, social rituals, behavior & values of common people have been emerged very clearly. This is why the discussion of Ramayana in regional languages has been relevant in time. So, here a sincere attempt is being performed in the discussion of relevance & importance of Rama-Katha on regional literature & its expansion of India.

Keyword): রামকথা, অবতারবাদ, সংস্কৃত-সাহিত্য, বৌদ্ধ-সাহিত্য, প্রাদেশিক-সাহিত্য।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে রামকথার প্রবাহ আবহমান কালের। কাল-কালান্তর ধরে গঙ্গা-যমুনার পুণ্য ধারার মতোই রামায়ণের গল্পগাথাগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি-মানসকে রসসিঞ্চিত করেছে। কেবল ভারতবর্ষেই নয় বহির্ভারতেও রামকথার পুণ্যস্রোত সমানভাবে প্রবাহমান। যথা- ব্রহ্মদেশ, কাম্বোদিয়া, থাইল্যান্ড, কোচিন, চায়না, মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি, ইন্দো-চায়না, ইন্দোনেশিয়া, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান। ভারতবর্ষের বাইরে, আধুনিক ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কার ভাষাতেও বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে একাধিক রামকথা রচিত হয়েছে। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতির মৌল উপাদানকে রামকাহিনীর সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করেছে, এতে নব নব চিন্তনে স্বতন্ত্র রামকথাবিষয়ক কাব্য যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি ভারতবর্ষের প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির নানাদিক প্রতিফলিত হয়েছে। এদিক থেকে রামকথাবিষয়ক কাব্যগুলি কেবল মহাকাব্যের জগতকেই সমৃদ্ধ করছে না; একইসঙ্গে অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় জাতিগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জগতকেও প্রতিফলিত করছে। এই অর্থে আখ্যান কাব্যগুলি ইতিহাস পদবাচ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন-“রামায়ণ-মহাভাতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে; কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্মের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।”

ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক রামায়ণগুলির উৎস বাল্মীকি প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণ; এ বিষয়ে প্রায় সকল পণ্ডিত সহমত পোষণ করে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হল বাল্মীকি এই জনপ্রিয় কাহিনী কোথায় পেলেন, আর সেখানে এই কাহিনি কিরূপ ছিল? বেদে রামকথার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে রামকথাকে আধার করে কোনো আখ্যান রচিত হয়নি। লৌকিক চর্চায় রামকথার কাহিনি যে সুপ্রচলিত ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় স্বয়ং বাল্মীকিতে। রামায়ণ রচনার পূর্বে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যদের পাঠিয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলে রামকাহিনী সংগ্রহ করতে, যা দিয়ে তিনি গড়ে তুলবেন এক অপূর্ব কাব্য। এদিক দিয়ে বিচার করলে রামের পূর্বসূরী অর্থাৎ ইক্ষ্বাকুবংশের সূতেরাই রামকথাবিষয়ক গাথা শুনিয়ে থাকবেন। স্বয়ং বাল্মীকি এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট ঙ্গিত দিয়েছেন-

“ ইক্ষ্বাকুগামিদং তেবাং রাজ্ঞাং বংশে মহাঅনাম্।

মহদুঃপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্।।”^২

‘ইক্ষাকুবংশীয় মহাত্মা নৃপতিগণের বংশে রামায়ণ নামে বিখ্যাত এই সুমহৎ উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে’। পরে এই রামকথাবিষয়ক জনপ্রিয় গাথাগুলি ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে, কিন্তু আদিতে এগুলির উৎস ছিল কতগুলি বিচ্ছিন্ন লৌকিক গাথা। ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটিও এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য, তিনি মনে করেন- এই আখ্যানাবলীর মূল বীজ ছিল কতগুলি উড়ো লৌকিক গল্প, যার বীজ স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। পরে বাল্মীকি রামকথা বিষয়ক গল্পবীজগুলিকে সংগ্রহ করে নিজের কল্পনা রসে জারিত করে তাকে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর কাহিনী রূপ দান করেন। এই কারণেই তিনি সর্বপূজ্য আদিকবি।

রামায়ণই সেই গ্রন্থ যা ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হয়েছে। এবং রামায়ণের আদি রচনাকার হিসাবে বাল্মীকিই যে সর্বপূজ্য, একথা প্রায় সকল পণ্ডিতগণ স্বীকার করে থাকেন। তবে রামায়ণ রচনার পথিকৃৎ হিসাবে বাল্মীকি মুনির পিতৃদেব চ্যবন মুনির প্রসঙ্গ আসে। সর্বপ্রথম তিনিই নাকি রামায়ণ রচনার কাজ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু এ-কাজ তাঁর দ্বারা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে বাল্মীকি একে সম্পূর্ণতা দান করেন। প্রথম খ্রীষ্টাব্দের কবি অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’ গ্রন্থে এর সমর্থন পাওয়া যায়- ‘বাল্মীকিরাদৌ চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো’^৩। তবে এই বৃহৎ কাব্যসৃষ্টিটি যে বাল্মীকির, এ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহান।

প্রাগবৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় জনমানসে আধ্যাত্মিক জীবন চর্চায় ভক্তির বীজ নিহিত ছিল। পরবর্তীকালে আর্ষদের বৌদ্ধিকতা যখন ভক্তির এই প্রাথমিক বৃত্তিগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হতে থাকে, তখন ভারতীয় ধর্মীয় ভাবের মধ্যে ধীরে ধীরে গভীরতা ও ব্যপ্তি আসে। অবতারবাদের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে নরোত্তম রামও বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজিত হতে থাকেন। রামচরিত্রের মধ্যে সমাজকল্যানের বীজ নিহিত থাকায় রামকে ঘিরে ভক্তির সমাবেশ ঘটতে থাকে। দক্ষিণ-ভারতে রামানন্দের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই রাম-উপাসনা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনাকে রামায়ণের মাধ্যমে সমাজজীবনে ছড়িয়ে দেবার কাজে তৎকালীন চিন্তাবিদেব্রা ব্রতী হন। আর তারই ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ রচনা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সর্বপ্রথম দ্বাদশ শতাব্দীতে তামিল ভাষায় রচিত হয় কন্ন রামায়ণ। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হয় তেলেগু রামায়ণ, নির্বাচনোত্তর রামায়ণ ও উত্তর রামায়ণ। চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হয় তেলেগু ভাষায় ভাস্কর রামায়ণ, মালয়ালম ভাষায় রামচরিতম, আসামে অসমীয়া ভাষায় রচিত হয় মাধবকন্দলী রামায়ণ, লবকুশের যুদ্ধ, গুজরাটি ভাষায় রামলীলা না পদো। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয় বাংলা ভাষায় কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ, মালয়ালম ভাষায় কন্নড় রামায়ণ; গুজরাটি ভাষায় রামবিবাহ, রামবালচরিত, সীতাহরণ। সন্ত তুলসীদাস রচিত রামচরিতমানস এবং উড়িয়া ভাষায় বলরামদাসের রামায়ণ রচিত হয় ষোড়শ শতকে।

এক.

ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহৎ পরিসরে এবং ভারতবর্ষের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে যে রামায়ণী ঐতিহ্য দীর্ঘকালব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে, তার উৎস বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণ। শুধু তাই নয়, সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের একটি সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। তাই ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণের ঐতিহ্য আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে পাণিনির গ্রন্থে ব্যাসসহ একাধিক কবির উল্লেখ থাকলেও বাল্মীকির পরিচয় সেখানে নেই। তবে ভাস রচিত ‘কাদম্বরী’ গ্রন্থে রামায়ণ কাহিনী চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে রাবণ, কিস্কিন্দ্যা ইত্যাদি পরিচয় ছাড়াও হনুমান বাহিনীর পরিচয় ও তাদের সূর্য পূজার বর্ণনা আছে। কৌটিল্য তাঁর রচনায় রাবণ ও দুর্যোধনের কার্যনীতি গ্রহণ করলে যে বিষময় ফল ফলবে তার উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান ধারায় হরিবংশ, বায়ুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীভাগবৎ, বৃহদ্রমপুরাণ প্রভৃতি সকল পুরাণ উপ-পুরাণের মধ্যে রামকথা পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রাচীন কবি ও নাট্যকার মুরারী গুপ্ত থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেব পর্যন্ত সংস্কৃত কাব্য-নাট্য সাহিত্যে বারবার বাল্মীকির রামায়ণ কাহিনী চর্চিত হতে দেখা গেছে। তবে এ পর্যন্ত সংস্কৃত রূপদী সাহিত্য রামায়ণ দ্বারা যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত হয়েছেন- তিনি মহাকবি কালিদাস। তাঁর রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূৎ কাব্যগুলি অপূর্ব কবিত্ব ও কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও ভট্টদেবের রাবণবধ, অভিনন্দের রামচরিত, ভোজের রামায়ণ চম্পুকাব্য উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থগুলির মূল আকরগ্রন্থ হল বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণ। তবে এইসকল রামকথাবিষয়ক গ্রন্থগুলির কোনোটিই সমগ্র রামকথাকে আশ্রয় করে তৈরি হয়নি। রামকাহিনী এখানে খণ্ডিত আকারে বর্ণিত হয়েছে।

আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত আর্ষরামায়ণের পরে রামকথাকে আশ্রয় করে যে সকল উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত রামায়ণ রচিত হয়েছে, সেগুলি হল- যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ এবং ভূশক্তি রামায়ণ। কৃষ্ণিবাসের পরবর্তীকালে বাঙালি

ও অবাঙালি কবিরা বাল্মীকির মূল রামায়ণ ছাড়াও এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন রামকথাবিষয়ক কাব্য রচনা করেছেন।

‘যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ’ বাল্মীকির নামে সমধিক পরিচিত। এটি সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম সুবিদিত দার্শনিক গ্রন্থ। মহাভারতীয় দেবর্ষি বশিষ্ঠ অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রকে ভববন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় স্বরূপ শান্তি সম্বন্ধীয় যোগোপদেশ প্রদান করেন। এটাই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। দুরূহ আধ্যাত্মতত্ত্বের যুক্তিপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ সম্পর্কিত এই গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্ব ও আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে বৈরাগ্য প্রকরণ, মুমুক্শু-ব্যবহার প্রকরণ, উৎপত্তি প্রকরণ, স্থিতি প্রকরণ, উপশম প্রকরণ এবং নির্বাণ প্রকরণ নামে ছয়টি প্রকরণ রয়েছে। নির্বাণ প্রকরণটি আবার পূর্বভাগ ও উত্তরভাগে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে।^৪ গ্রন্থটি ২৪০০০ শ্লোক বিশিষ্ট এবং এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে অনুমান করা হয়।

‘অধ্যাত্মরামায়ণ’ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস রচিত বলে প্রচারিত। সগুকাণ্ড বিশিষ্ট গ্রন্থটিতে রামকাহিনি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত এই কাব্যটিতে মহাদেব পার্বতীকে কলিযুগের পাপ থেকে মুক্তির জন্য রামচরিত শ্রবণের মাহাত্ম্য কীর্তন প্রসঙ্গে রামচরিত বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থের ‘রামহৃদয়’ ও ‘রামগীতা’ অংশ দুটি ভক্তদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতেরা গ্রন্থটিকে চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর বলে অনুমান করেন।

‘অদ্ভুত রামায়ণ’ বাল্মীকি বিরচিত সগুকাণ্ড রামায়ণের অর্বাচিন পরিশিষ্ট বলে সুধীসমাজে প্রচারিত। গ্রন্থটির অপর নাম ‘অদ্ভুতদোত্তরকাণ্ড’। মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক ভরদ্বাজ মুনির কাছে এই গ্রন্থের কাহিনি কথিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে ২৭টি অধ্যায় ও ১৩৬০টি শ্লোক রয়েছে।^৫ সীতাকে এখানে রাণী মন্দোদরীর কন্যারূপে দেখান হয়েছে। সীতা এখানে মূল প্রকৃতি ও শক্তিরূপে বর্ণিত। পুঙ্করদ্বীপে সহস্রস্রন্ধ রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রাম মুর্ছিত হয়ে পড়লে সীতা প্রচণ্ডা মূর্তি ধারণ করে রাবণবধ করেন। কাব্যটিতে সীতার মহিমা, সহস্রনাম স্তোত্রসহ সাংখ্যযোগ এবং শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিবিধ তাত্ত্বিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি কাশ্মীরের শাক্ত-সমাজে বহুল প্রচারিত।

‘আনন্দরামায়ণ’ স্বয়ং বাল্মীকি রচিত বলে লোক পরম্পরায় সমধিক প্রচারিত। এটি নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলি যথাক্রমে- সারকাণ্ড, যাত্রাকাণ্ড, যাগকাণ্ড, বিলাসকাণ্ড, জন্মকাণ্ড, বিবাহকাণ্ড, রাজ্যকাণ্ড, মনোহরকাণ্ড এবং পূর্ণকাণ্ড।

‘ভূশন্ডি রামায়ণ’-এর বক্তা স্বয়ং কাকভূশন্ডি। বাল্মীকি অনুসারী এই কাব্যটি নানা লোককথা ও রামভক্তিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত রামায়ণকার সন্তকবি তুলসীদাস তাঁর ‘রামচরিতমানস’-এর উত্তরকাণ্ডে কাকভূশন্ডির দীর্ঘ কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে রামভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

দুই.

রামকথার অত্যধিক জনপ্রিয়তার কারণে সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি পালি, প্রাকৃত ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রামকথা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে রামকথাকে আশ্রয় করে বিবিধ রামকথাবিষয়ক সাহিত্য রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতে লেখা বৌদ্ধদের ‘লঙ্কাবতরসূত্র’ গ্রন্থটি আলোচনা করা যেতে পারে। এই গ্রন্থে রাবণ ও বুদ্ধকে সমসাময়িক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাবণ এখানে বুদ্ধদেবের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছে ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ১০৮টি প্রশ্নের উত্তর জানতে চান। রামকথাকে আশ্রয় ও অনুসরণ করে বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ ‘দশরথজাতক’-এ অনুরূপ রামকথা বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটির কাহিনী এইরূপ- বারাণসীর রাজা দশরথের ছিল ষোল হাজার মহিষী। এদের মধ্যে দশরথের পাটরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। এক সময় দশরথের পাটরাণীর মৃত্যু হলে দশরথ পুনরায় নতুন মহিষী গ্রহণ করেন। দশরথ তার সেবায় মুগ্ধ হয়ে তাকে বর দিতে চাইলে তিনি ভবিষ্যতে প্রয়োজন মতো চেয়ে নেবেন বলে জানান। অতঃপর তার গর্ভে ভরত নামে পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। তিনি রাজা দশরথের কাছে পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। দশরথ এই প্রস্তাবে অসম্মত হলে রাণী তার পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা রাজাকে স্মরণ করিয়ে দেন। রাজা দশরথ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে বাধ্য হন। অতঃপর ভীত-সন্ত্রস্ত রাজা দশরথ পুত্র-কন্যাদের রক্ষার জন্য তাদের বার বছর আত্মগোপন করে থাকার পরামর্শ দেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গেলে ভরত তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য বনে যান। কিন্তু রাম বার বছর পূর্ণ না করে রাজপুরীতে ফিরে যেতে অসম্মত হন। তখন ভরত রামের পাদুকা জোড়া নিয়ে এসে রাজ্য শাসন করতে থাকেন।

‘দশরথজাতক’-এ বুদ্ধদেবের অনুসরণে রামকে আঁকা হয়েছে। রাম এখানে ভগবান বুদ্ধের মতোই প্রশান্ত, নির্বিকার; সুখে-দুঃখে তিনি একেবারে স্থবির বনে গেছেন। লক্ষ্মণ ও সীতা যেখানে পিতার মৃত্যু সংবাদে সংজ্ঞা হারিয়েছেন; রাম সেখানে বুদ্ধের মতোই জন্মান্তর

প্রতিকল্প; তিনি কত স্থির- এটা দেখানোই যেন জাতকের উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, এক সময় হয়তো বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে ভাই-বোনের বিবাহ সিদ্ধ ছিল; এই কারণে জাতকের গল্পে রাম-সীতাকে ভাই-বোনের প্রতিকল্প হিসাবে দেখানো হয়েছে।

তিন.

রামায়ণের কালজয়ী গল্পগুলি যেমন সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। রামায়ণই একমাত্র গ্রন্থ যাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের প্রায় সব ভাষাতে রামকথাবিষয়ক কাব্য রচিত হয়েছে। বলা যায় সমগ্র ভারতবর্ষ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি সমৃদ্ধ সাহিত্যধারা রামকথাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেছে। যেমন-অন্ধ্রপ্রদেশে রঙ্গনাথী রামায়ণ, মহারাষ্ট্রে মারাঠি কবি একনাথের ভাবার্থ রামায়ণ, বলরামদাসের জগমোহন রামায়ণ, তামিলদেশে কন্ম রামায়ণ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলায় রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অসমীয়া ভাষায় মাধবকন্দলী রামায়ণ, ওড়িয়ায় বিলঙ্কা রামায়ণ, মণিপুরীতে অঙ্গম গোপী রামায়ণ, নেপালীতে ভানুভক্তের রামায়ণ এবং হিন্দিতে (অবধি) সন্তকবি তুলসীদাস রচিত রামচরিতমানস প্রশংসনীয় সৃষ্টিকর্ম।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার মতো অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু ভাষায় রামকথাবিষয়ক কাব্য রচনার প্রবণতা সুপ্রাচীনকালের। মূলত মহাভারত রচনার মধ্যে দিয়েই তেলেগু সাহিত্যের হাতে খড়ি। নন্নয় (Nannaya), তিক্কন (Tikkana) এবং এরনা (Errana) এই কবিদ্রয় মহাভারতের অষ্টাদশ পুরাণকে অনূদিত করেন। এদের মধ্যে তিক্কন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর রামায়ণ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে আরনা 'শ্রীরামায়ণ' রচনা করেন।^১ কিন্তু দুঃখের বিষয় 'শ্রীরামায়ণ' এখন আর পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় পঞ্চদশাধিক রামকথাবিষয়ক কাব্য ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত হয়েছে। যেমন- কাণ্ড রামায়ণ, দণ্ডক রামায়ণ এবং তেতগীতি রামায়ণ ইত্যাদি।^২ তেলেগু সংস্কৃতিতে রামকথা বিষয়ক আখ্যানকাব্যগুলির রচয়িতারা নিজেদের নামে আখ্যানের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন- কবি ভাক্করের নামানুসারে 'ভাক্কর রামায়ণ', কবি মোল্লার নামানুসারে 'মোল্লা রামায়ণ', অনুরূপভাবে গোপীনাথ রামায়ণ, রঘুনাথ রামায়ণ, ডোড্ডা রামায়ণ, মণিকোণ্ডা রামায়ণ, একোজী রামায়ণ এবং বিশ্বনাথ রামায়ণ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত তিক্কনের নির্বাচনোত্তর রামায়ণই তেলেগু সাহিত্যধারায় প্রথম রামকথা বিষয়ক কাব্য। এই শতাব্দীতেই রচিত হয় তেলেগু সাহিত্যের জনপ্রিয় রামকথাবিষয়ক কাব্য রঙ্গনাথী রামায়ণ। তিক্কনের কাব্যটি কেবল উত্তরকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে রচিত; কিন্তু রঙ্গনাথী রামায়ণে রামায়ণের পূর্ব ও উত্তরকাণ্ডের সমগ্র ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বাঙালি কবি কৃত্তিবাসের কাব্যে যেমন বাঙালি লোকজীবনের একটি সামগ্রিক চিত্র আমরা পাই, তেমনি এই কাব্যে সমসাময়িক তেলেগু জনজীবনের খুঁটি-নাটি বিষয় চিত্রিত হয়েছে। কাব্যটি বাল্মীকি প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণ অনুসারী হলেও এখানে লোকজীবন থেকে নানা গল্প গাথাকে স্থান দেওয়া হয়েছে - যা বাল্মীকি রামায়ণে খুঁজে পাওয়া যায় না। তেলেগু লোকজীবনে প্রচলিত একাধিক গল্প গাথাকে এই কাব্যে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে; এই কারণে তেলেগু সংস্কৃতি ও জনজীবনে এই কাব্য এত জনপ্রিয় হতে পেরেছে। তেলেগু দেশে রামায়ণের প্রভাব এতটাই যে, এখানকার সংস্কৃতিতে রাম ও সীতা পিতৃ-মাতৃরূপে পূজিত হয়ে থাকেন। প্রায় হাজার বছর ধরে চলে আসা তেলেগু সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা শাখায়- যেমন উৎসব-অনুষ্ঠান, গান-বাজনা, নাটকভিনয়, পুতুল নাচে রামকথার ধারা আজও বহমান।

অন্ধ্রপ্রদেশে বিশেষ করে তেলেগু সংস্কৃতিতে রামকথা বিষয়ক কাব্য রচনা ধার্মিক ও পবিত্র কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পরবর্তিকালে একাধিক কবি তেলেগু ভাষায় রামকথা বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। এদের মধ্যে তেলেগু সাহিত্যে বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন কবি সম্রাট বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ। তিনি তাঁর রামকথাবিষয়ক কাব্য 'রামায়ণ কল্পবৃক্ষম' রচনা করে জ্ঞানপিঠ পুরস্কারে ভূষিত হন।

তেলেগু সাহিত্যে কেবল বাল্মীকি প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ করা হয়নি; পাশাপাশি একাধিক ভাষায় রচিত রামায়ণের স্বচ্ছন্দ তেলেগু ভাষায় অনুবাদ দৃষ্ট হয়। যেমন- আধ্যাত্ম রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ- ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং হিন্দি কবি তুলসীদাসের রামচরিতমানস ও তামিল কবি কন্ম রচিত 'শ্রীরামাবতারচরিতম'-এর মতো একাধিক প্রাদেশিক ভাষায় রচিত রামকথা বিষয়ক কাব্য তেলেগু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মহারাষ্ট্রীয় ভক্তধারায় মারাঠি কবি একনাথের আবির্ভাব একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তিনি মারাঠি সন্তকবি জ্ঞানেশ্বরের মহৎ কর্মধারাকে নতুন করে প্রাণশক্তি দিয়ে উজ্জীবিত করে তাকে মারাঠা সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তবে কবি একনাথের সৃষ্টিকর্ম কেবল ভক্তিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাঁর রচিত ভাবার্থ রামায়ণে সমসাময়িক মারাঠি জনজীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক ও রাজনৈতিক টানা-পোড়েনের নানা দিক চিত্রিত হয়েছে।

মারাঠি কবি একনাথের আবির্ভাব ষোড়শ শতকে।^৮ এই সময়ে মারাঠি জনজীবনে রামকথাবিষয়ক কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দক্ষিণ-ভারতে মুসলমান শাসন কালে হলে হিন্দু সমাজ মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িত, পদদলিত হয়। এই সময়ে মহারাষ্ট্রের জাতীয় জীবনে চরম অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয়। সমাজজীবনে নারীহরণ, ধর্মান্তরিতকরণ এবং হত্যালীলা সমানে চলতে থাকে। কাজেই ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রতিশোধক হিসাবে এই সময়ে সন্তকবিরা সাধু সমাজের ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য রামের আদর্শকে রহিমের প্রতিপক্ষরূপে প্রতিষ্ঠা দিলেন; এবং এই নতুন আদর্শকে সামনে রেখে মানুষ স্বমহিমায় বাঁচার প্রাণশক্তি খুঁজে পেলেন। এই প্রেক্ষাপটে কবি একনাথ তাঁর ‘ভাবার্থ রামায়ণ’ রচনা করেন। এদিক থেকে একনাথের ‘ভাবার্থ রামায়ণ’ মহারাষ্ট্রীয় জীবনধারায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। যথার্থ কারণেই তাঁর কাব্যে রাম সকল শুভ ও মঙ্গলের প্রতীক এবং রাবণ দেববিগ্রহের ধ্বংসকারী তথা সকল অমঙ্গলের প্রতীকরূপে চিত্রিত।

মারাঠি কবি একনাথ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের অনুসরণে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু কাহিনী কথনে তিনি স্বচ্ছন্দ অধিকার ভোগ করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যে ভগবতপুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, উপনিষদ, নারদভক্তি ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ- ইত্যাদি পুরাণবিষয়ক গ্রন্থ থেকে যেমন টিকা-টিপ্পনী সংগ্রহ করেছেন তেমনি লোকজ-উপাদান থেকে একাধিক আখ্যান উপ-আখ্যানকে অপূর্ব কাব্যরসমণ্ডিত করে গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। তিনি একদিকে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িককালের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে যেমন উপাদান সংগ্রহ করেছেন তেমনি প্রাচীন মারাঠি সংস্কৃতি ও সাধারণের ধর্মবিশ্বাস এবং কর্মধারাকে মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই কারণে মারাঠি জীবনধারায় একনাথের ‘ভাবার্থ রামায়ণ’ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

মারাঠি ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচয়িতা হিসাবে একনাথের ‘ভাবার্থ রামায়ণ’ এর নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তিকালে মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাকে আধার করে একাধিক রামকথাবিষয়ক কাব্য রচিত হয়েছে। একনাথের পূর্বেই সংস্কৃত ভাষায় ‘আনন্দ রামায়ণ’ রচিত হয়। গবেষকদের ধারণা এটি কোনো মারাঠি কবির দ্বারা রচিত। যাইহোক কবি একনাথ মারাঠি ভাষায় রামকথাবিষয়ক কাব্য রচনার যে পথ দেখিয়েছেন, পরবর্তিকালে এই পথকে আধার করে বহু মারাঠি কবি রামায়ণকাব্য রচনা করেন। একনাথের প্রপুত্র মুক্তেশ্বর (Mukteshwar) ‘সংক্ষেপ রামায়ণ’ রচনা করেন। শ্রীধরের কাব্য বাঙালি কবি কৃষ্ণবাসের মতোই মারাঠি দেশে প্রতি ঘরে ঘরে আদরের সামগ্রি। তাঁর ‘রামবিজয়’ ও ‘হরিবিজয়’ কাব্য দুটি সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

শ্রীধরের মৃত্যুর বছরে মারাঠি দেশে পণ্ডিতকবি মোরোপন্তের (Moropant) আবির্ভাব হয়। তিনি প্রায় ১০৮টি রামকথা বিষয়ক কাব্য রচনা করেন; এর মধ্যে ৯০টি কাব্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটি হল- ‘মন্ত্র রামায়ণ’, ‘চিত্র রামায়ণ’, ‘দিব্য রামায়ণ’ এবং ‘লঘু রামায়ণ’।^৯ তবে মারাঠি কবি একনাথের দ্বারা যাঁরা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন- সন্তকবি রামদাস ও তুকারাম। সন্তকবি রামদাসের অনুসরণে আরও দুই কবি রামকথা বিষয়ক কাব্য রচনা করেন, এরা হলেন-মাধবস্বামী ও গিরিধরস্বামী। এর মধ্যে গিরিধরস্বামী পাঁচখানি রামকথা বিষয়ে কাব্য রচনা করেন। এগুলি যথাক্রমে- ‘আদ্য রামায়ণ’, ‘মঙ্গল রামায়ণ’, ‘সুন্দর রামায়ণ’, ‘হৃন্দ রামায়ণ’ এবং ‘সংকেত রামায়ণ’।

একনাথ ও রামদাসের সমসাময়িক ও পরবর্তিকালে একাধিক কবি রামকথা নিয়ে কাব্য রচনা করে মারাঠি সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছেন। কিন্তু সন্তকবি একনাথ এবং রামদাসই প্রকৃত অর্থে মারাঠি জনজীবনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। এই দুই মহৎ সৃষ্টিকর্ম থেকে উপাদান সহযোগে মারাঠি সাধারণেরা তাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতকেই সমৃদ্ধ করেনি, উপরন্তু স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে তার যথার্থ প্রয়োগ কি করে করতে হয়, তা’ও যেন শিখলেন। প্রকৃত অর্থে রামকথা মারাঠি জনজীবনে সৌভাগ্য এনে দিয়েছে।

কবি মাধবকন্দলী আদিকবি বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অনুসরণে অসমীয়া ভাষায় রামকথাবিষয়ক কাব্য রচনা করেন। তিনি সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে কাব্য রচনা করেন। মাধবকন্দলী মূলতঃ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের গৌড়ীয় পাঠকে অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেন।^{১০} তিনি দেশীয় ভাষায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনার কথা বললেও লক্ষকাণ্ড পর্যন্ত রচনা করে তিনি কাব্য শেষ করেছেন। কোনো কোনো সংস্করণে আবার পাঁচটি কাণ্ডের উল্লেখ রয়েছে; আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের প্রসঙ্গ সেখানে নেই। পরবর্তিকালে অসমীয়া ভাব ও সংস্কৃতির হ্রস্টা শংকরদেব এই রামায়ণের উত্তরকাণ্ড রচনা করে একে পূর্ণতা দেন। কবি শংকরদেবের অপূর্ব কবিত্বশক্তি ও রচনাদক্ষতা অসমীয়া রামকথাকে আরো বিস্তৃত আকার দান করেছে।

মাধব কন্দলীর রামায়ণ বাল্মীকি রচিত আর্ষ রামায়ণকে অনুসরণ করে রচিত হলেও তিনি এর অঙ্ক অনুসরণ করেননি। তাঁর কাব্যে সমসাময়িক দেশকাল, রাজনীতি, ধর্মীয় ভাবাবেশ, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন- সর্বোপরি জীবনযাত্রার খুঁটি-নাটি বিষয়গুলি, অসমীয়া জনজীবনকে প্রতিফলিত করেছে। কাব্যটিতে শৈববাদের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি অনেক জায়গায় রামকে শিবের আদলে এবং সীতাকে চণ্ডী

ও পার্বতীর সঙ্গে একাত্ম করে ঐকেছেন। আসলে কবির সমসাময়িক নাথধর্ম ও তার শাখা শাক্তবাদের প্রভাব তাঁর কাব্যকে প্রভাবিত করেছে। লক্ষ্যাকাণ্ডে শুক-সারণের উপস্থিতিতে রাম রাবণের দশমুণ্ড কেটে দেবী চণ্ডীকে অর্ঘ্য প্রদানের প্রসঙ্গ রয়েছে।^{১১} কাব্যখানির সহজ সরল ভাষা সহজেই সহৃদয় পাঠকের মনকে হরণ করে। উত্তর-পূর্ব ভারতে মাধব কন্দলী রচিত রামায়ণ সুপ্রাচীন কাব্য। এদিক থেকে কাব্যটি অসমীয়া সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

ওড়িশায় রামকথার ঐতিহ্য সুপ্রাচীনকালের। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে ওড়িশায় রামায়ণ সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তি খন্ডগিরির হাতিগুফাতে একটি মায়া মৃগকে হত্যা করার দৃশ্য খচিত হয়েছে। মৃগকে হত্যা করার জন্য একজন ধনুর্ধারী যোদ্ধা অনুধাবন করছেন এবং কাছে একটি বৃক্ষের উপর একজন লোক লুকিয়ে বসে আছে। এখানে ধনুর্ধারী লোকটিকে রাম এবং গাছে বসে থাকা লোকটিকে রাবণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।^{১২}

সরলা দাস রচিত বিলঙ্কা রামায়ণ উড়িয়া ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন; কাব্যটির রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন বাংলার জনমানসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তেমনি সরলা দাস বিরচিত এই কাব্যটিতে সমসাময়িক উড়িয়া জনজীবনের লৌকিক সংস্কৃতির নানাদিক চিত্রিত হয়েছে। কাব্যটিতে একইসঙ্গে উড়িয়া রামায়ণ চর্চাকে আধার করে ভক্তি ও সংস্কৃতির মেল বন্ধন দেখানো হয়েছে।

কবি ভানুভক্ত রচিত রামায়ণ, নেপালি ভাষায় রামায়ণ চর্চার সফল ও সার্থক প্রয়াস। কাব্যটি ১৮৪১-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে রচিত হয়।^{১৩} বাল্মীকি যেমন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিত হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন অমৃত শ্লোক এবং এই ঘটনা তাঁকে রসদ যুগিয়েছিল কাব্য রচনায় তেমনি এক গরীব, সহায়সম্বলহীন ঘাসুড়িয়ার জীবনমূল্যবোধ, পরোপকারবৃত্তিই উড়িয়া কবি ভানুভক্তকে কাব্য রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক অঞ্চলগুলির মতোই নেপালী জনজীবনে প্রচলিত নানা লোকগাথায় ও সংস্কৃতিতে রামায়ণ চর্চা সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বহমান। কিন্তু উনিশ শতকের আগে নেপালি ভাষায় রামকথাবিষয়ক কোনো লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থ পাওয়া যায় না। নেপালে লিচ্ছবি রাজা চম্পকদেবের সময়ে রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে রাজদরবারসহ মুক্তমঞ্চে ও লোকমঞ্চে নাটকাদি ও গীত পরিবেষণ করা হত। মল্লরাজা জয়স্বির জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্মোপলক্ষে ৪৮৭ বিক্রম সংবতে রামায়ণ কথার অনুষ্ঠান করেন।^{১৪} এছাড়াও বালুন লোকনৃত্যে, খেজারি ভজনে রামায়ণের প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বাংলার কৃত্তিবাসের মতোই কবি ভানুভক্ত বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণে নেপালী ভাষায় রামায়ণ রচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক জনসাধারণের বোধ্য আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কবি ভানুভক্তের রামায়ণ নেপালী ভাষা, সাহিত্য ও জাতিকে যেমন ঐকবদ্ধ করেছে, একইসঙ্গে নেপালি জাতির চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচিবোধ, সংস্কার তথা জীবনযাপনের খুঁটি-নাটি দিকগুলি মূর্তমান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কবি ভানুভক্ত রচিত রামায়ণই নেপালের সাধারণ মানুষকে পাঠে আগ্রহী করেছে এবং স্বাক্ষরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কৃত্তিবাসের কাব্যে যেমন বাংলা ভাষার সহজ সরল প্রাঞ্জলরূপ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি কবি ভানুভক্তের রামায়ণে নেপালী ভাষা গঠনের একটি পরিপূর্ণরূপ পরিলক্ষিত হয়।

ইতিহাসের সাক্ষ্য নিলে দেখা যাবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাম উপাসনাকারী দল মণিপুরে এসে বসবাস শুরু করে। এবং ১৭৩৭ সালে রাজা গরীব নিওয়াজ (King Garib Niwaz) সিলেটের অধিবাসী শান্তিদাস মহারীর অনুগামীরূপে মণিপুরে বৈষ্ণবীয় শাখায় রামায়ণের ধারা প্রবর্তন করেন।^{১৫} গরীব নিওয়াজের সময়কালেই মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম রাজধর্মরূপে স্বীকৃতি পেতে থাকে। তিনি রামমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ, শক্রয় ও সীতার পূজা প্রচলন করেন। এমনকি মহাবলী নামে হনুমানও এই সময় থেকে পূজিত হতে থাকেন।

রাজা গরীব নিওয়াজের সময়কাল থেকেই মণিপুরে রামায়ণ চর্চার সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই সময় মণিপুরী ভাষার কাব্যকার অঙ্গম গোপী বাংলার কবি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। তবে তাঁর কাব্য কৃত্তিবাসের অঙ্ক অনুসরণ নয়; এটি তাঁর মৌলিক সৃষ্টিকর্ম। অঙ্গম গোপীই মণিপুরী ভাষার প্রথম রামায়ণকার; কিন্তু তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত ভাষাকে নিপাট আধুনিক মণিপুরী ভাষা বলা যায় না। ব্রজবুলির মতোই এটি একটি কৃত্রিম ভাষা। মূলতঃ বাংলা, অসমীয়া ও মণিপুরী ভাষার এক মিশ্র কৃত্রিমরূপ এটি।

যাইহোক অঙ্গম গোপী মণিপুরী সাহিত্যধারায় রামায়ণ রচনার যে পথনির্দেশ করেছেন, পরবর্তীকালে আধুনিক লেখকেরা তাঁর সৃষ্ট পথ ধরেই আধুনিক মণিপুরী ভাষায় রামকথাবিষয়ক কাব্য রচনায় প্রায়সী হয়েছিলেন। আধুনিক লেখকদের হাত ধরেই রামায়ণের নতুন নতুন রচনা, মেঘনাদবধের মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ, মণিপুরী সংস্কৃতিতে রামকাহিনীর স্বাভাবিক প্রীতিকেই প্রকটিত করে।

এতদ্ব্যতীত যাত্রাপালা, কথকতা, দোল-দুর্গোৎসবে রামায়ণ এই অঞ্চলে দীর্ঘকালব্যাপী অপরিহার্য অঙ্গরূপে সংস্কৃতিতে ও জনমানসে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে চর্চিত হয়ে এসেছে।

সন্তকবি তুলসীদাস (১৫৮৯-১৬৮০) মধ্যযুগের হিন্দি সাহিত্যধারায় শ্রেষ্ঠকবি।^{১৬} তাঁর একাধিক রচনা হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু 'রামচরিতমানস'-ই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ম। সমগ্র হিন্দি সাহিত্য তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও এর জুড়ি পাওয়া যাবে না। কাব্যটি মূলতঃ অবধি ভাষায় রচিত; ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের সাধারণের মুখের ভাষা এটি। এই সময় মুঘল শাসনাধীনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অচলাবস্থা চরমে পৌঁছেছিল। বিশেষ করে মুঘল সাম্রাজ্য আকবরের শাসনকালে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয় দিক দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় ছিল নিপীড়িত, নিপেষিত ও পদদলিত। দক্ষিণ ভারতে উদ্ভূত ভক্তি আন্দোলন এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে একত্রিত করলেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম এবং শৈবধর্মের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ ছিল। এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমাজে প্রয়োজন ছিল এক বহুগোচিত আদর্শ নায়কের, যিনি হালছাড়া সমাজকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারবেন। ভক্তকবি তুলসীদাস এমন বহুগুণের আকর রামের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এবং তাঁকেই সমাজের আদর্শ 'মর্যাদাপুরুষোত্তম' রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন; উদ্দেশ্য রহিমের প্রতিপক্ষ হিসাবে সমাজে রামের প্রতিষ্ঠা।

তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত; কাব্যটি আগাগোড়া ভক্তিরসের আধার। এই কাব্যে লোকজীবনের পারিবারিক, সামাজিক কল্যাণকর দিকগুলিরামায়ণের ঘটনা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ভক্তকবির আধ্যাত্মিক আকৃতি, পারিবারিক কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সংসার আশ্রিত অনুরাগটি কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। রামের অবতারত্ব, অন্যান্য ভাইদের ঈশ্বরের অংশীরাপে ব্যাখ্যা, সীতার পাতব্রতা, ভরতের রামভক্তি, লক্ষ্মণের সেবা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি এবং সর্বোপরি প্রভুভক্তিরূপে তুলসী রামায়ণ সর্বজনের মানসিক শান্তির আশ্রয়রূপে সমাদৃত হয়ে আসছে।

কাব্যটির বিশেষত্ব হল, রাম-সীতা ভগবান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অবতাররূপে ধরায় নররূপে অবতীর্ণ হয়েও তাঁদের ঈশ্বরত্ব কখনো বিস্মৃত হননি। রাজা দশরথ রামকে ঈশ্বরের অবতার যেনে তাঁর প্রতি ভক্তিতে অটল থেকেছে। রামের শৈশব বর্ণনা অনেকাংশে ভাগবতের ননীচোরা কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনীয়। তুলসীদাস রাম-সীতাকে কলুষমুক্ত করতে দ্বিতীয়বার সীতা বিসর্জন, সীতার পাতাল গমন, শুদ্রক হত্যা, লক্ষ্মণ বর্জন- ইত্যাদি নিন্দনীয় কাহিনীগুলিকে তিনি স্বজ্ঞানে বর্জন করেছেন। তাঁর কাব্যে প্রথাগত কাহিনীর পরিসমাপ্তি লক্ষ্যকাণ্ডে। সমগ্র উত্তরকাণ্ড জুড়ে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, রামরাজ্যের বর্ণনা এবং কাকভুশন্ডি ও গরুড়ের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে রামকথা শবণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

বাংলাদেশে রামকথার ঐতিহ্য সুপাটীনকালের। দক্ষিণ ভারতে রামানুজ সম্প্রদায়ের মাধ্যমে রামকথার ধারা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লে উত্তর-পূর্ব ভারতেও এর প্রভাব পড়ে। ভারতবর্ষে প্রাদেশিক রামায়ণগুলির মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে কন্মন রচিত তামিল রামায়ণই সম্ভবত প্রথম রামকথাবিষয়ক কাব্য। এরপর উত্তর-পূর্বভারতে রামায়ণ রচনাকার হিসাবে মাধবকন্দলীর অসমীয়া রামায়ণের কথা মনে আসে। এই কাব্যটি রচিত হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। তাছাড়া কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকি প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণের যে গৌড়ীয় পাঠকে অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন, সেটি বাংলাতেই রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি কৃত্তিবাসের পূর্বেও বাংলাদেশে লোকমুখে, গাথায় সর্বোপরি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় রামকথা পরিবেশিত হত। কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে এই লোকপ্রচলিত বিষয় থেকেও আখ্যান সংগ্রহ করে থাকবেন। তবে এ কথা অবিংসবাদিত সত্য যে, কৃত্তিবাসই প্রথম কবি যিনি বাংলাদেশে প্রথম রামকথাবিষয়ক কাব্য রচনা করেন। বলা যায়, তাঁর রচিত 'শ্রীরামপাঁচালি' বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির পাঠাভ্যাস রীতি তৈরি করেছে। বিশেষ করে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলায় রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের যে রীতি শুরু হয়েছিল, তা আজও গায়ন বা কথকঠাকুরের মুখে মুখে গ্রাম-বাংলায় পরিবেশিত হয়ে চলেছে। প্রায় ছয় শতাধিক বৎসরের সুদীর্ঘকাল ব্যাপী কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির মানস গঠনে ক্রিয়াশীল হয়েছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমান আদরের বস্তু হয়ে ওঠেছে। আজও বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন চর্চায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনা, উপমা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলির ঘনিষ্ঠ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাস বাংলায় রামকহিনী রচনার যে গোড়াপত্তন করেছিলেন তাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে বাংলায় রামকথা বিষয়ক কাব্য রচনার প্লাবন দেখা দেয়। প্রায় পঞ্চাশাধিক কবি রামকথা নিয়ে কাব্য রচনা করেন। তবে এঁদের মধ্যে গুটি কয়েক কবি ছাড়া প্রায় সকলেই রামায়ণের কোনো নির্বাচিত বিষয়কে কাব্যের কাহিনীরূপে নির্বাচন করেছেন। কৃত্তিবাসকে বাদ দিলে অদ্ভুতাচার্য বা নিত্যানন্দ আচার্য, গঙ্গাদাস সেন, ভবানী দাস ও রামমোহন দ্বিজ- এই চারজন কবিই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। অত্যধিক

জনপ্রিয়তার কারণে স্বল্প কবিত্বসম্পন্ন কথকঠাকুর ও গায়নদের হাতে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয় অংশগুলির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই প্রায় ছয়শত বছর পূর্বে রচিত মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের শুদ্ধরূপ এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, স্বল্প কবিত্বশক্তি সম্পন্ন এমন বহু কবি রয়েছেন যাঁরা কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসের নামে আত্মগোপন করে আছেন। এই একবিংশ শতকে মূল রামায়ণ থেকে তাদের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকে আলাদা করা অত্যন্ত দুর্লভ কাজ। এমনি করেই বোধহয় হারিয়ে গেলেন মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদকর্তা কবি চন্ডিদাস।

কৃত্তিবাস তাঁর কাব্য রচনা করেন অসমীয়া রামায়ণকার মাধব কন্দলীর রামায়ণ রচনার প্রায় এক শতাব্দী পরে এবং হিন্দিকবি তুলসীদাসের অবধি ভাষায় রচিত ‘রামচরিতমানস’ রচনার প্রায় একশ বছর আগে। এই সময় রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলা মুসলমান শাসনাধীনে। হিন্দুসমাজ সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ছিল নিপীড়িত ও পদদলিত। সমাজ-জীবনে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না; সবদিক থেকেই হিন্দু সমাজ ছিল দিশেহারা। কাজেই ইসলামীয় সংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে আপন ধর্মকে বাঁচাতে হিন্দু ধর্মের কর্ণধরেরা পৌরাণিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন সংক্রান্ত পৌরাণিক গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃতির জটিল জটা বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন। উদ্দেশ্য একদিকে ইসলামীয় সংস্কৃতির হাত থেকে হিন্দুধর্মের অনাগত ভাঙ্গনকে রক্ষা করা এবং পৌরাণিক গ্রন্থগুলিকে ভক্তিরসের আদলে গড়ে সাধারণের বোধ্য ভাষায় তাকে জনসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কৃত্তিবাস তাঁর আত্মপরিচয়ে লিখেছেন-

“সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।

লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত।”^{১৭}

কেবল কৃত্তিবাস নয়, মধ্যযুগীয় অনুবাদ শাখায় এমন একাধিক কবির সন্ধান আমরা পাই যারা কৃত্তিবাসের দেখানো পথকে অনুসরণ করেছেন।

কৃত্তিবাস মূলতঃ সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে আদিকবি সপ্তকাণ্ড রামায়ণকে শিরোধার্য করে তাকে প্রয়োজন মতো গ্রহণ ও বর্জন করে আপন কবিত্বশক্তি ও কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তুলেছেন এক অপূর্বকাব্য। এই সৃজনের মূলে রয়েছে বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি ও বাঙালি মানস। কৃত্তিবাসী রামায়ণেই প্রথম বাঙালির একটি গোটা চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখা গেল। বাঙালি তার চাল-চলন, হাব-ভাব এবং মানস অভিব্যক্তি নিয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণে পূর্ণ পরিচয় লাভ করলো। অর্থাৎ বাঙালি কি? কি তার পরিচয়? তার আচার-সংস্কারই বা কি? কোথায় এ জাতির মাহাত্ম্য- এই সমগ্রটাই যেন বাঙালি কৃত্তিবাসী রামায়ণের দর্পণে দেখলেন এবং দর্পণস্থ আপন প্রতিবিম্ব দেখে বিস্মিত হলেন। বাঙালির সংসার-সমরাজ্যে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা গার্হস্থ্য জীবনের এ এক সর্বাসুন্দর চিত্র। সুতরাং কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ কেবল রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা নয়; এ যেন বাঙালির চিরকালীন সংসার-সমুদ্রে ঘটে চলা অসংখ্য চলমান চিত্রের সংকলন।

কৃত্তিবাস বাল্মীকি প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণের গৌড়ীয় পাঠকে অনুসরণ করে সপ্তকাণ্ডে রামায়ণ রচনা করেছেন। খণ্ডগুলি যথাক্রমে- আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যাকাণ্ড, কিষ্কিন্দ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড। তিনি মূলতঃ তাঁর কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। মূল বাল্মীকি রামায়ণের সর্গ বিভাজন এখানে অনুপস্থিত। কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যের শুরুতেই চ্যবন মুনিপুত্র দস্যুরত্নাকরকে রামনাম শুনিয়ে মহাকবি বাল্মীকিতে রূপান্তরের জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করেছেন। গল্পরস পিপাসু স্পর্শকাতর বাঙালি আজও এই কাহিনী শ্রবণ করে অশ্রুশক্তি নয়নে মোহমান হয়ে যায়। যেমনভাবে মূর্খ কালিদাস মহাকবি বনে গেলেন, দস্যুরত্নাকরের বাল্মীকিতে রূপান্তরও বাঙালি সমাজজীবনে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এই লোকপ্রচলিত আখ্যানটি মূল বাল্মীকি রামায়ণে নেই; এটি কৃত্তিবাসের মৌলিক সৃষ্টিকর্ম। কৃত্তিবাস সমকালীন বাঙালি সমাজজীবনের গভীরে প্রবেশ করে, তার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে পঞ্চদশ শতকের বাঙালি মানসের উপযোগী করে এক সার্থক কাব্য রচনা করেছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের অপর উল্লেখযোগ্য দিক হল এর লোকজীবন সম্পৃক্তি। বহুকাল ধরে ঘটে চলা বাঙালি সমাজজীবনের উৎসব-অনুষ্ঠান ও বিবিধ প্রথার যেমন অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, তেমনি বাঙালির খাদ্য-পানীয়, গৃহস্থালির উপকরণ, শিল্পদ্রব্য, লোককথা, অদৃষ্টবাদ, আশীর্বাদ ও অভিশাপবৃত্তান্ত- ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগ করেছেন। আমাদের ভাবতে অবাক লাগে রামায়ণের ঘটনাগুলি আমাদের চেনা পরিচিত বাংলাদেশে সংঘটিত হয়নি। এবং রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যে বাঙালি পুরুষ রমণী ছিলেন না; তাঁরা যে বৈদিক আর্যসংস্কৃতির প্রতিভূ ছিলেন- একথা যেন আমরা বিশ্বাসই করতে পারি না। ডঃ তনিমা চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন- “ কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যখানিকে বাংলার লোক ঐতিহ্যের অনুকূলে সাজিয়ে তোলার সুবাদে বাল্মীকির কাব্যখানি থেকে অনেকাংশে সরে এসেছেন। যদিও কাব্য রচনায় লোক ঐতিহ্যের উপাদান-উপকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহুলাংশেই তিনি বাল্মীকির অনুসারী। প্রয়োজনে লোক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গগুলি তিনি

সংক্ষেপকরণ এবং রূপান্তর সাধনও করিয়েছেন। এর ফলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ হয়ে ওঠেছে বাংলার লোক ঐতিহ্য বিশিষ্ট একখানা মহাকাব্য।”^{১৮}

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব যেমন সাহিত্যে, তেমনই বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনে বিশেষ করে শিল্প-সংস্কৃতিতে এর অনুরূপ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। মন্দির, টেরাকোটা, বালুচরী শাড়ির নকশা, মৃৎশিল্পে, পটচিত্রে রামায়ণী ঐতিহ্য অনুসৃত হয়ে চলেছে। এছাড়াও বিভিন্ন নৃত্যে যেমন- ছৌনাচের তালে, লৌকিক গাথায়, গানে, কৌতুকহাস্যে, যাত্রাপালায়, উৎসব-অনুষ্ঠানে, বহুরূপীর সাজসজ্জায় সর্বোপরি বাঙালির জাতীয় জীবনের খুঁটি-নাটি বিষয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

কালে কালে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণরসকে আধার করে কত জনপদ, নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছে; কত বুলবুলি-বর্গির দল এসেছে এবং সসন্ত্র সংগ্রামে ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিকে রক্তে রাঙিয়ে গেছে; এমনকি আধুনিককালে বিদেশি বণিকদের অধীনে ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মিক সংস্কৃতিরই কেবল পরিবর্তন হয়নি; জীবনের মূল্যবোধেরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষের নানা ভাষা, নানা বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে একমাত্র রামকথাই একদেহে লীন হতে পেরেছে। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি জাতি-উপজাতির মধ্যে রামকথার সুগভীর প্রভাব রয়েছে এবং রামকথাকে আধার করে প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণও তৈরি হয়েছে- যার মধ্যে তাদের সংস্কৃতির মূলগত উপাদানগুলি মিশে গেছে। এ ধারা আবহমান কাল ধরে চলছে। কোনো দুর্দান্ত প্রতাপশালী বহিঃশত্রুর দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির অস্বাভাবিক পরিবর্তন না হলে ভারতীয় জনজীবনে রামকথার প্রভাব কোনো দিনই ক্ষুণ্ণ হবার নয়।

তথ্যসূত্র:

- ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: প্রাচীন সাহিত্য, রামায়ণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা-৭।
- ২। বাল্মীকি: রামায়ণম্: শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নসেন (সম্পাদিত), বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০১৫, আদিকাণ্ড, সর্গ-৫, শ্লোক-৩ পৃষ্ঠা-১৩।
- ৩। অশ্বঘোষ: বুদ্ধচরিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৬, সর্গ-১, শ্লোক-৪৮।
- ৪। বাল্মীকি: যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, শ্রীচন্দ্রনাথ বসু (অনূদিত ও সম্পাদিত), গিরিজা, কলকাতা, ২০১৩।
- ৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১৬-২০১৭, পৃষ্ঠা-৩৬৪।
- ৬। Ramayana Through The Ages: Avadhesh Kumar Singh (editor), K. Malayavasini, Ranganatha Ramayana: Telugu Ramayana D.K. Printworld (p) Ltd. New Delhi, 2007, page no.95
- ৭। Ibid: K. Malayavasini, page no.96
- ৮। Ibid: Aruna Dhere, Eknath's Bhavarth Ramayana, page no.211
- ৯। Ibid: Aruna Dhere, page no. 235
- ১০। Ibid: Indira Goswami, Madhava Kandalis Ramayana and Contemporary Society, page no. 149.
- ১১। ibid: Indira Goswami, page no. 155
- ১২। ভূঞা কৃষ্ণচন্দ্র: ওড়িশার সংস্কৃতি ও সাহিত্যে রামায়ণ, কোরক পত্রিকা, রামায়ণ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৩২৭।
- ১৩। ঘোষ আনন্দগোপাল: নেপালী সাহিত্য ও সমাজে রামায়ণ, ওই, পৃষ্ঠা-৩৬৬।
- ১৪। ওই: পৃষ্ঠা-৩৬০।
- ১৫। চট্টোপাধ্যায় জ্যোৎস্না: ভারতীয় ভাষাচার্য রামায়ণ: কল্লড়, গুজরাতি, কাশ্মীরি, মণিপুরী, ওই, পৃষ্ঠা-৩৪৮।
- ১৬। Ambashankar Nagar: Tulasidasa's Rama-Charita-Manasa An Overview, Ibid, page no. 305
- ১৭। রামায়ণ: কৃত্তিবাস ওঝা, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৮।
- ১৮। ডঃ তনিমা চক্রবর্তী: কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাংলার লোক-ঐতিহ্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০।